



ডাক সংক্রান্তি: বাংলার এক লৌকিক রীতি

Dak Sankranti: A Folk Tradition of Bengal

Tanusree Mandal

Assistant Professor

Department of Bengali

Government General Degree College,

Kushmandi, Dakshin Dinajpur

West Bengal, India

Email: tanusreemandal4u@gmail.com

Abstract

There are various secular customs or parbans in Bengal. Analyzing the series of these Parbans, the identity of Bengal's society can be found. Especially in rural Bengal, the identity of the peasant class lies in the Parbans; their demands are described in them. One such parban is 'Dak Sankranti'. On the last day of the month, the Sun moves from one Rashi to another, which is called *Sankranti*. *Dak Sankranti* is celebrated on the last day of the Bengali month of Ashwin. At the root of this Parban is a desire for grain. In our agrarian civilization, women are closely associated with agriculture. Grains are produced from the earth. On the other hand, women have the ability to bear children. It is from this sense that femininity is imposed on the world. This is how fertility cults came about. Rice is the main crop of Bengal. When the fruit of this paddy plant comes from the flower, it is fed to the earth by placing it on the pregnant woman's head, according to Bengali custom. This is called *Sadbhabhakhana*. This custom is known as *Dak Sankranti* Parban. This secular custom of Bengal has been analyzed in its entirety in this article.



Received: 31.10.2025

Accepted: 25.11.2025

Published: 31.12.2025

CJHSSC, Volume: 1

Issue: 2, December 2025

Page: 254 - 261

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18265690>

Copyright: Author © 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Published by: Seth Soorajmull Jalan Girls' College,
Kolkata, West Bengal, India.

Available at: www.ssjalangirlscollege.org.in/journal.php

Email: confluence.ssjgc@gmail.com

Keywords: Society, Secular Custom, Farmer, Women, Earth, Grain

আমাদের সমাজে বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, ব্রত, পার্বণ প্রচলিত। এই পার্বণগুলি প্রচলিত হয়েছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে অর্থাৎ নানারকম চাওয়া থেকে। সেই চাওয়ার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে পার্বণগুলিতে ব্যবহৃত সামগ্রীতে ও ছড়ায়। এই চাওয়া থেকে একটি সমাজের মানুষের মানসিকতা স্পষ্ট হয়। আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে অবস্থান করে আমাদের সমাজে প্রচলিত এই পার্বণগুলির পরিচয় জানা জরুরি। কারণ এই আচার বা পার্বণ রক্ষিত করে আমাদের দেশীয় সংস্কার। বর্তমান প্রজন্মের কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে। এই আগ্রহ হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে লোকসমাজে প্রচলিত কৃষিকাজ সম্পর্কিত আচারগুলি। আমরা বিস্মৃত হচ্ছি আমাদের নিজস্ব সংস্কার আর সরে যাচ্ছি ক্রমশ শিকড় থেকে দূরে। এই নিবন্ধে কৃষিকাজ সম্পর্কিত এমনই একটি পার্বণের বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে যা চিনে নিতে সাহায্য করে অতীতের লোকায়ত সংস্কারকে। সাহায্য করে শিকড়কে স্মরণ করে আদিম মাতৃকা পৃথিবীদেবীর কাছে শ্রদ্ধায় নতজানু হতে।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত এক পার্বণ- ডাক সংক্রান্তি। এই পার্বণের মূলে আছে শস্যের আকাঙ্ক্ষা। বঙ্গদেশ কৃষিভিত্তিক। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ধারা বাহিত হয়ে চলেছে আমাদের চেতনায়। এই কৃষিসভ্যতার ধারা বহু প্রাচীন। সভ্যতা বিকাশের আদিপর্বে মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী ও শিকারজীবী। খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে শিকারজীবী হয়েছে মানুষ। সেই শিকার থেকে ক্রমে এসেছে পশুপালন। এটিই হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার জীবিকা। মানুষ তখন ছিল যাযাবর প্রজাতির। এই শিকারজীবিতার পর্ব পেরিয়ে ভ্রাম্যমাণ মানুষ স্থায়িত্ব পেয়েছে কৃষিকাজের মাধ্যমে। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে প্রকৃতির কাছে নতজানু হয়েছে। ঋতু অনুযায়ী প্রকৃতির পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য তখনো মানুষের কাছে অধরা ছিল। এই প্রাকৃতিক শক্তির তাৎপর্য বুঝতে না পারা মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবজ্ঞানে পূজা করেছে। এছাড়া বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যে জীবিকার উপর নির্ভরশীল ছিল সে পশুপালন হোক বা কৃষি, তাকেও দেবজ্ঞানে পূজা করার একটা ধারা লক্ষিত হয়েছে।

এই কৃষিকাজ শুরু হয়েছে মূলত অনার্য গোষ্ঠীর হাত ধরে। গোষ্ঠীজীবনে প্রাধান্য পেয়েছে মেয়েরা। এই প্রাধান্য পাওয়ার অন্যতম কারণ সন্তানধারণ ক্ষমতা। এই সন্তানধারণ ও সন্তানপালনের তাগিদে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার একটা ধারা গড়ে উঠেছে। সন্তান লালিত হয়েছে মাতৃপরিচয়ে, গোষ্ঠীর সন্তানরূপে। পিতৃপরিচয়ের ধারা তখনো গড়ে ওঠেনি সমাজে। এই পরিচয়ের প্রেক্ষিতে মাতৃতান্ত্রিকতা এসেছে সমাজে। এদেশে আগমনকারী আর্য জাতি ছিল মূলত শিকারজীবী। এই শিকার করা থেকে প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে পুরুষেরা। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে কৃষিকাজ সম্পর্কিত হয় জীবনধারা। কৃষিকাজের সূত্র ধরেই স্থায়ী বাসস্থানের ধারণা গড়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই কৃষিকাজ প্রথম এসেছে মেয়েদের মাধ্যমে। কৃষিকাজের ফলেই উদ্ভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে মানুষ। সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচনের

তাগিদে পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজন পড়ে। এখান থেকেই সমাজে তৈরি হয়েছে পিতৃতান্ত্রিকতার ধারা। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত ঋকবেদে দেখা গেছে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। বৈদিক সংহিতার প্রাচীন ব্যাখ্যা আচার্য যাক্স তিনটি দেবতার কথা উল্লেখ করেছেন- অগ্নি, ইন্দ্র, ও সূর্য। এই দেবতার পৃথিবী (Earth), অন্তরীক্ষ (Atmosphere), ও দ্যুলোকের (Heaven) দেবতা। বৈদিক যুগে দেবতার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখতে পাওয়া গেছে। কারো মতে, একই দেবতার বিভিন্ন নাম, আবার কারো মতে সমস্ত দেবতাই স্বতন্ত্র। এই বৈদিক ঋষি দেবতা হিসেবে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সূর্য এদের সাথে উষা, সবিতা এই দেবতার কথাও বলেন। উষার যে অরুণ রাগ, তা থেকেই উষাকে বন্দনা করার কথা এসেছে। বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতিকে দেবী হিসেবে কল্পনা করেছেন। প্রাকৃতিক দেবদেবীর উপরে মানবত্ব আরোপিত হয়েছে। ঋকবেদে পৃথিবী মাতার স্তুতি দেখতে পাওয়া গেছে। বিশ্বের পিতা ও মাতা হিসেবে দ্যাবাপৃথিবী জননীর কথা বলা হয়েছে। এখানে আকাশ ও পৃথিবীকে সমগ্র বিশ্বের মাতা পিতা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। ঋকবেদে দেবী হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় উষাদেবীর। বৈদিক সূক্তগুলিতে উষাদেবীকে প্রণয়িনী যুবতী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বেদে পৃথিবীকে জননী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর উপর নারীত্ব আরোপ করার ফলে পৃথিবীকে জননী রূপে ভাববার একটা ধারা তৈরি হয়েছে।

নারী প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী। সন্তান জন্মদান করে সে। আবার একই রকম ভাবে কৃষিসভ্যতায় মানুষ লক্ষ্য করেছে যে শস্য উৎপন্ন হয় পৃথিবী থেকে। একদিকে পৃথিবী থেকে উৎপাদিত হয় শস্য অন্যদিকে নারীর দেহকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে সন্তান। এই বোধ পৃথিবী ও নারীকে এক করে ভাবতে শিখিয়েছে। পৃথিবীতে আরোপিত হয়েছে নারীত্ব। ঋকবেদে আকাশ ও পৃথিবীকে জগতের পিতা ও মাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে যাকে দ্যাবাপৃথিবী বলা যায়। যখনই পৃথিবীতে আরোপিত হয়েছে নারীত্ব তখন থেকেই শস্য সংক্রান্ত উর্বরতার সাথে তুলনীয় হয়েছে নারীর গর্ভাবস্থা। এভাবেই গড়ে উঠেছে উর্বরতা কেন্দ্রিক কাল্ট। এই কাল্টের ধারায় পরবর্তীকালে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান প্রাধান্য পেয়েছে। এই উর্বরতা কেন্দ্রিক কাল্টের উল্লেখ দেখা গেছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতাতোও। সেখানে প্রাপ্ত শিলমোহরে দেখা গেছে নারীর ছবি। যে নারীর যোনি থেকে শস্য উৎপাদিত হওয়ার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কৃষিকাজ আবিষ্কৃত হওয়ার পর পৃথিবী কল্পিত হলেন নারী রূপে। পৃথিবীর উপর এই নারীত্ব আরোপ করার ধারা লক্ষ্য করা গেছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম জাতিগুলির বিশ্বাসে ও ধর্মধারায় প্রকৃতিকে নারী হিসেবে ভাবার প্রবণতা বিদ্যমান। নারীর উর্বরাশক্তি ও প্রকৃতির উর্বরাশক্তিকে এক করে দেখা হয়েছে। সেজন্যই আমাদের পূজা পার্বণের ধারায় সেটি অনুসৃত হয়েছে। কৃষি সংক্রান্ত উৎসবের প্রতীক মেলে গণেশ পূজার আদি রূপটির মধ্যেও। গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্র মাসের পঞ্চমী তিথিতে। চতুর্থী তিথিতে উদযাপিত হয়ে পঞ্চমী তিথিতেই বিসর্জন। এই পঞ্চমীতে বিসর্জনের পর ষষ্ঠী থেকে শুরু হয় আরেকটি পার্বণ যেখানে আগমন ঘটে গৌরী দেবীর। এই গৌরী দেবীর কাছে শস্যের প্রার্থনা জানানো হয়। গণেশ পূজার অঙ্গ হিসেবে যে সমস্ত বস্তু

বা সামগ্রী দেওয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারকেল, পায়েস, বাতাসা, গুড়। কিছু ক্ষেত্রে গণেশের হাতে থাকে- পদ্ম, পূর্ণকুম্ভ, কল্পকলতা, ধানের শীষ আর ডালিম। এই উপকরণগুলির দিকে খেয়াল রাখলে দেখা যায় একদিকে যেমন নারকেল উর্বরাশক্তির প্রতীক তেমনি অন্যদিকে ডালিমও উর্বরাশক্তির প্রতীক। এই ডালিম তাৎপর্যবাহী কারণ এটি রক্তবর্ণ বহুবীজ ফল। বিভিন্ন দেশের দেবীদের হাতে এই ডালিম ফল দেখা যায়। যেমন- গ্রিক দেবী ডিমিটার, রোমান দেবী ইথিনা। এই ডালিমের লালরং ঋতুরক্তের ইঙ্গিতবাহী যা আসলে উর্বরাশক্তিকেই দ্যোতিত করে। নারীর ঋতুরক্তের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় ডালিমকে উর্বরা শক্তির প্রতীক রূপে দ্যোতিত করা হয়। শস্য দেবতার আবাহনের সাথে এভাবেই মিশে যাচ্ছে নারীর উর্বরতা।

নারীর উর্বরাশক্তির দ্যোতনা এসেছে পৃথিবীর উপর। তাই নারী সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োগ ঘটেছে পৃথিবীর উপর। সেই সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠান- ডাক সংক্রান্তি। সাধারণত, বাঙালি সমাজে নারীর সন্তান জন্মের পূর্বে সাধ ভক্ষণ করানো হয়। এক্ষেত্রেও সেই রীতির অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন এই রীতি পালিত হয়। এই সংক্রান্তি আসলে সূর্যের সংক্রমণের রীতি। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী সূর্য বারো মাসে বারোটি রাশিতে অবস্থান করে। দৈনিক হিসেব অনুযায়ী সূর্য প্রতিদিন এক ডিগ্রি করে সরে যায়। এমনি করে প্রতিদিন এক ডিগ্রি করে সরতে সরতে, ত্রিশ দিনের দিন, এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরিত হয়। সূর্যের একরাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরের দিনটিই সংক্রান্তি। যেকোনো আচার অনুষ্ঠানের পক্ষে এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। এই সৌরপঞ্জি ব্যবহৃত হয়েছে অধিকাংশ আচারের ক্ষেত্রে। ডাক সংক্রান্তির ক্ষেত্রেও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিনটিকে নির্বাচিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই রীতি পালিত হয়। সংক্রান্তির দিন বিকেল থেকেই এই আচারের আয়োজন শুরু হয়। এই আচার আসলে পৃথিবীকে নারীর প্রতিভূ মনে করে তাকে সাধ ভক্ষণ করানোর রীতি। গৃহস্থ চাষিরবাড়িতে বিকেল থেকেই এই আয়োজন শুরু হয়। কালো কচুপাতা কেটে ধুয়ে রাখা হয়। যে কুলোতে সাধের উপকরণ রাখা হয় সেটি পরিষ্কার করে রাখা হয় বিকেলেই। সংক্রান্তির দিন ভোরবেলা বাড়ির গৃহবধূ পরিষ্কার পোশাক পরিধান করেন। শঙ্খ বাজিয়ে ও উলুধ্বনির মাধ্যমে কুলোর সামনে প্রথমে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। তারপর দেওয়া হয় চন্দনের ফোঁটা শেষে কলাপাতার গোড়ার দিকের মোটা অংশে প্রদীপের কালি থেকে কাজল তৈরি করে তার ফোঁটা দেওয়া হয়। এই সিঁদুর লালরং বা রক্তবর্ণের দ্যোতনা বহন করে। এই সিঁদুর সধবা নারীর ইঙ্গিতবাহী। এই লালরং নারীর ঋতুরক্তের পরিচায়ক, যার জন্য নারী সন্তান ধারণের অধিকারী। এই রক্তবর্ণ বা রক্তচিহ্নের সঙ্গে বিবাহের অনুষ্ঠানের যোগ দেখতে পাওয়া যায়। এই রক্তবর্ণ সিঁদুর দিয়ে আসলে নারীটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় কোন একটি পুরুষের সন্তান ধারণ করার জন্য। উর্বরাশক্তির প্রতীক সিঁদুর। এর লাল রং পবিত্র। আমাদের দেশে বিভিন্ন পূজার ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় এই সিঁদুরের ব্যবহার। অন্যদিকে চন্দন পবিত্রতার ইঙ্গিতবাহী। তাই দেওয়া হয় চন্দনের ফোঁটা। আর কাজল গর্ভবতী নারীকে সমস্ত অশুভ শক্তির থেকে দূরে রাখে। তাই কাজলের ফোঁটা দেওয়া হয়। এই তিন সারি ফোঁটা

দেওয়ার পর সাধের উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় পাকাকলা, কাঁচা তেঁতুল, আখ,কাঁচা হলুদ, পোড়ামাটি, শুকিয়ে যাওয়া তালের আটির নরম শাঁস, বাতাসা, তুলসী পাতা। সাধের উপকরণে ব্যবহৃত কলা উর্বরা শক্তির প্রতীক। যেকোন শুভ আচারে কাঁচা হলুদের ব্যবহার লক্ষণীয়, সেই সূত্রেই এসেছে হলুদের ব্যবহার। কাঁচা তেঁতুল- অম্ল জাতীয়, যা গর্ভবতী নারীর উপাদেয় খাদ্য রূপে বিবেচিত। এই উপকরণগুলি কচুপাতায় মুড়ে নতুন পাটের আঁশ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। প্রতিটি কচুপাতায় সিঁদুর, কাজল ও চন্দনের ফোঁটা দিতে হয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে কোন একটি চাষী গৃহস্থবাড়িতে এই আয়োজন হয়। অন্যরা সেই বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যান। পরীক্ষার করে রাখা নতুন পাটকাঠির মাথায় এই কচুপাতায় মোড়া সাধ বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর বাড়ির চাষী গৃহস্থ পরিকৃত ধুতি পরিধান করে আর একটি ধুতি গায়ে জড়িয়ে একমুঠো পাটকাঠি হাতে নিয়ে বাস্তুভিটার কোণে পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়ে এই ছড়াটি আবৃত্তি করেন-

লক্ষ্মীর পূর্বে
পাটকাঠি আলো দে,
এক গোলা শস্য নে,
এক গোলা ধান নে,
এক জোড়া হাল বলদ নে,
এই পথ দিয়ে এসো গো।

বসতবাড়ির কোণে, ঘরের চালে কচুপাতায় মোড়া সাধ রাখা হয়। চাষের জমিতে, বাড়ির গোলায়, খড়ের গাদায় রেখে আসা হতো সাধ। এই পর্ব সমাপা হলে ভোরবেলা পাড়ার ছেলেমেয়েরা হাতে কুলো নিয়ে রাস্তায় বসে কুলো বাজাতে বাজাতে এই ছড়াটি আবৃত্তি করতো -

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে,
গর্ভে বসে সাধ খাও বর দাও গো।
এই বাড়ির পোকামাকড় ওই বাড়ি যা,
হরিণ শেয়াল খেয়ে গেল যুদ্ধ লেগে যা ।

এই পার্বণ ও এই ছড়ার উল্লেখ করেছেন ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী ‘বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ’ গ্রন্থে। তবে এই ছড়াটির একটু পরিবর্তিত রূপ উল্লেখিত আছে গ্রন্থটিতে-

‘ আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে
সাধ খাও বর দাও হে-
আমাদের বাড়ির পোকামাকড় ওদের বাড়ি যা
হরিণ শেয়াল খেয়ে গেল দুর্জয় দুর্জয়।’

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছামতি নদীর এক পারের মানুষ অর্থাৎ এক অঞ্চলের মানুষ এই রীতি অনুসরণ করেন। মূলত হাসনাবাদ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত চাষাবাদের অঞ্চলে দেখা গেছে এমন রীতিপদ্ধতি। আবার ইছামতির অপরপারে বাদুরিয়া অঞ্চলে এই আচারের পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে। সেখানে এই কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধ আচারে পিঠেপুলি খাওয়ার রীতি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়াও ভোরে উঠে সাধের উপকরণ হিসেবে চালগুড়ো করে জলে মিশিয়ে, সেই জলে সিঁদুর, কাজল, চন্দন মিশিয়ে সেটি চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত। বাঙালি সমাজে গর্ভবতী নারীকে সাত মাসে সাধ ভক্ষণ করানো রীতি। এই আচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাত মাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সাত রকমের ফল, সাত রকমের মিষ্টি, সাত রকম আচার, সাত রকম রান্না করা সবজি, ও পায়ের খাওয়ানো হয়। তার পূর্বে ওই দম্পতিকে স্নান করানো হয়। স্নানের পর নববস্ত্র পরিধান করে, নতুন মালা, ঘুনসি পরিয়ে বরণ করা হয়। এই বরণডালায় রাখা হয় – পাঁচটি এয়ো ঘট, যার প্রতিটি গর্ভ থাকে ধান্য পূর্ণ। একছড়া কলা রাখা হয়। এছাড়া থাকে ধান, দূর্বা। সিঁদুর, কাজল, চন্দন রাখা হয় বরণডালার কুলোতে আর রাখা হয় প্রদীপের আলো। ধান সমৃদ্ধির ও দূর্বা সুদীর্ঘ জীবনের প্রতীক। ধান ও দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করার অর্থ সমৃদ্ধশালী ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য কামনা জানানো। বরণডালায় রাখা কলাও উর্বরা শক্তির প্রতীক। আশীর্বাদের পর গর্ভবতী নারীকে সাত রকমের খাবার খাওয়ানো হয়। এভাবে সমাপন হয় সাধ ভক্ষণ রীতি। অঞ্চল অনুযায়ী এই রীতির প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়।

ডাক সংক্রান্তি পালিত হওয়ার সময়কাল আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন। এই সময়কালের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে, কার্তিক মাস আদতে আমন ধানের সময়কাল। আমন ধান শীতকালীন। জুন বা জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ধানের সময়কাল। ধানের জীবনচক্র কমবেশি একশো থেকে একশো কুড়ি দিন। এই জীবনচক্রের তিনটি পর্যায় - অঙ্গজকাল, জননকাল ও দানাপুষ্টিকাল। ধানের বীজ ছড়ানো থেকে শুরু করে অঙ্কুরোদগম এবং গাছের বেড়ে ওঠা পর্ব অর্থাৎ শৈশবকাল, সেটিকেই অঙ্গজ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ে ধানগাছ বৃদ্ধি পায় ও ধানগাছ থেকে পাশকাঠি বেরোয়। এই পাশকাঠি বেরনোর পর্ব চলে চব্বিশ থেকে বিয়াল্লিশ দিন সময়কাল পর্যন্ত। অঙ্গজ পর্বের পর ধানগাছে যখন শীষমুকুল দেখা দেয় এই পর্বটিকে বলা হয় জনন পর্ব। শীষমুকুল দেখা দেওয়ার পঁচিশ দিন পর গাছে ফুল আসে। জনন পর্বে থাকে- কোষ বিভাজন, পরাগ সংযোগ ও নিষিক্তিকরণ। উনিশ থেকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত এই পর্ব স্থায়ী হয়। ধানগাছে ফুল ফোটার পর আসে দানাপুষ্টি পর্ব, যেখানে মূলত ধানের মধ্যকার দুধ অংশ ধীরে ধীরে পুষ্টি পেতে থাকে। একেবারে শুরুতে থাকে পাতলা দুধের মত তরল। এই তরল ধীরে ধীরে ঘন হয়ে পুষ্ট হতে থাকে। ধান রোয়া থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর শীষমুকুল হতে দেখা যায়। মুকুল হওয়ার পঁচিশ দিন পর ধানের ফুল ফোটে। ফুল ফোটা থেকে শুরু করে পঁচিশ দিনের মধ্যে দানাপুষ্টি হয়। কার্তিক মাস ধান কাটার মরশুম। এই মরশুমের আগে যখন দানাপুষ্টি পর্ব চলে ওই সময় সংক্রান্তির আচার পালন করা হয়। ঠিক

যেমন, গর্ভবতী নারীকে সাত মাসে সাধ ভক্ষণ করানোর আচার প্রচলিত আছে। গ্রাম্য পরিভাষায় একে ডাক সাঁকরানিও বলা হয়। এই আমন ধানের মধ্যে পড়ে- বাদকলমকাটি, চূর্ণকাটি, নাগরা, ভাসামানিক, রূপশাল, ঝাঙাশাল, কলমা, দুধসর, তিলককাচারি, করিমশাল, কালান্তি, বাগতুলশি, পাটনাই, লাউতি, আছড়া ও কুমড়াগোড় চাল।

উল্লিখিত পার্বণটির মৌখিক ছড়ার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে, সেখানে দেবী লক্ষ্মীকে আবাহন করা হচ্ছে। সভ্যতার শুরুর পর্বে ধরিত্রীকে নারী রূপে ভাবা হয়েছে। ধরিত্রীকে নারী ভেবেই তাঁর উপরে যাবতীয় নারীত্ব আরোপিত হয়েছে ও সেই সংক্রান্ত যাবতীয় আচার পালন করা হয়েছে। এখানে পৃথিবী বা ধরিত্রী মাতার রূপ আরোপিত হয়েছে দেবী লক্ষ্মীর উপর। লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাবের ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে দেখা যায় যে, ঋকবেদে এই দেবীর কোন উল্লেখই নেই। সেখানে কেবল উষাদেবীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। ঋকবেদের অর্বাচীনকালে লিখিত যে অখিলসূক্ত সেখানে লক্ষ্মী দেবীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। যদিও এটি অনেক পরবর্তীকালের। এখানে দেবী সুবর্ণবর্ণা ও রজতমাল্যধারিণী। ঋকবেদ ছাড়া দেবী লক্ষ্মীর যে উল্লেখ পাওয়া গেছে, সেখানে দেখা যায় যে তিনি মূলত সৌন্দর্যের দেবী। প্রথমদিকে শ্রী ও লক্ষ্মী নামে আলাদা দেবীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই শ্রী সম্পদ বা শোভার দেবী আর লক্ষ্মী সৌন্দর্যের দেবী। বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রী ও লক্ষ্মীর আলাদা অস্তিত্ব বর্ণিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, বৌদ্ধায়নের ধর্মসূত্রে শ্রী ও লক্ষ্মীর উল্লেখ আছে। সেখানে সম্পদের দেবী হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছেন শ্রী। পরবর্তীকালে আদিত্য পত্নী রূপে শ্রী ও লক্ষ্মীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। ভাগবতেও শ্রীর আলাদা উল্লেখ পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে শ্রী ও লক্ষ্মী এক হয়ে মিশ্রিত হয়েছেন। ক্রমে লক্ষ্মী হলেন সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী। সম্পদের দেবী হওয়ায় তিনি সাধারণের পূজা লাভ করলেন। সম্পদের শ্রী বর্ধিত হয়ে তার সৌভাগ্য সমস্ত কিছুতে বর্ধিত হল। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিই সেখানে সম্পদ। কৃষিকাজের অন্যতম প্রধান ফসল ধান। তাই দেবী লক্ষ্মীর হাতে শোভা পেয়েছে ধান। ভারতবর্ষে এসময় সম্পদ বলে বিবেচিত হয়েছে ধান। ধান্যরূপা লক্ষ্মীকে বন্দনা করা হয়েছে এখানে। একদিকে যেমন, শ্রী সম্পদ বা শোভার দেবী ছিলেন, তিনি লক্ষ্মী দেবীর সাথে মিশে গেছেন কালক্রমে, তেমনি অন্যদিকে বসুধা বা বসুন্ধরা বা পৃথিবীদেবীও মিশে গেছেন দেবী লক্ষ্মীর সত্তায়। কৃষিপ্রধান এই দেশে তাই লক্ষ্মীর অনুষঙ্গে এসেছে পাটকাঠি, গোলা ও বলদের প্রসঙ্গ। প্রতিটি বস্তুই কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গোলায় রাখা হয় সম্বৎসরের ধান। প্রাণধারণের অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে। চাষের ক্ষেত্রে হাল-বলদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির প্রতি প্রার্থনা জানানো হয়েছে এই আচারে। বৌদ্ধতন্ত্রে এই বসুধারা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে তাঁর হাতে ধানের শীষ লক্ষিত হয়েছে। বসুধারা দেবীর হাতের এই ধানের শীষ কালক্রমে সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর হস্তগত হয়েছে। সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী হয়ে উঠেছেন শস্যের দেবী। তাই তাঁর কাছেই মানুষ প্রার্থনা জানিয়েছে শস্যের উৎপাদনের। চেয়েছে দেবীকে সাধ ভক্ষণ করিয়ে তাঁকে তুষ্ট করে ফসল অর্থাৎ সৌভাগ্যের ও সমৃদ্ধির অধিকারী হতে।

এই পার্বণটিতে বাঙালির সমাজ জীবনের একটি ছবি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ সেই সময় শীতের আনাগোনা শুরু। শীতের ভোরে উঠে শস্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীকে আবাহন করা। সেই আবাহনের অঙ্গ হিসেবে পাড়ার সমস্ত ছেলেমেয়ের একসাথে ছড়া আবৃত্তি করতে করতে কুলো বাজানো গ্রামের রাস্তায় বসে। আবার কুলো বাজানো হয়ে গেলে কুলো ধুয়ে বাড়ি ফিরে আসা। কার্তিক মাস ফসল কাটার মাস। এই পার্বণের কিছুদিন পর ফসল কাটা হবে। এই ফসল বা শস্যই সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়। গোলাভরা ধান উঠবে কৃষকের অঙ্গনে। যা কিছুটা সৌভাগ্য বয়ে আনে গ্রামীণ কৃষকের জীবনে। এই সৌভাগ্য ও সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখে সাধারণ কৃষক। সাধারণের সৌভাগ্য সূচক সেই প্রার্থনাই এসেছে এই পার্বণটিতে। হাল-বলদ নিয়ে গোলাভরা ধান ও শস্যের প্রার্থনা জানিয়েছে কৃষক। দেবী লক্ষ্মীকে সাধ ভক্ষণ করিয়েছে। পৃথিবীর উপর মানবীত্ব আরোপ করে মাতৃকাশক্তির আরাধনা আসলে বহু প্রাচীন এক অনার্য সভ্যতার ধারা বহন করে চলেছে। এই ধারা বাহিত ‘বঙ্গ’ শব্দের মধ্যেও। শব্দটিতে অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব প্রবল। ‘বঙ্গ’ শব্দ এসেছে কোল শব্দ ‘বোঙা’ থেকে, যার অর্থ দেবভূমি। বঙ্গদেশের সাধারণ কৃষকের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার রূপ প্রতিফলিত এই পার্বণটিতে।

তথ্যস্বর্ণ

- ১। চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, লোকায়ত দর্শন, ১৩৬৩, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- ২।, সেনগুপ্ত পল্লব, পূজা পার্বণের উৎসকথা, ১৯৫৯, পুস্তক বিপণি।
- ৩। ভট্টাচার্য হংস নারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ(তৃতীয় পর্ব), ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড।
- ৪। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, পৌষ ১৪০২, বিশ্বভারতী।
- ৫। ড. চট্টোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ও ড. মাইতি বিশ্বনাথ, ধান উৎপাদন, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৮৪, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
- ৬।, ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ, বৈদিক দেবতা, ১৩৫৭ মাঘ, বিশ্বভারতী।
- ৭।, সম্পাঃ ড. চক্রবর্তী বরুণ কুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ২০১৬, দে বুক স্টোর।